Journal of Cultural Research Studies, Vol-1 Issue-1(2022), p. 12-23
Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Journal.

বাংলার তন্তুবায় সমাজের অতীত-ইতিহাসের সন্ধানে

Nilay Kumar Basak, Assistant Teacher, Santipur Muslim High School, Email

কারুশিল্পের অন্যতম প্রধান শাখা বয়নশিল্পের যেমন একটি বর্ণিল ও উৎসাহব্যঞ্জক ইতিহাস রয়েছে ঠিক তেমনই এই বয়নশিল্পের সাথে যুক্ত শিল্পীদেরও একটি সমৃদ্ধ অতীত রয়েছে। এই বয়নের কাজ যিনি সমাধা করেন তিনি তন্তুবায়। তবে এই শ্রেণিকে চিহ্নিত করতে তাঁতি, জোলা, যুগী, কারিগর প্রভৃতি অভিধা ব্যবহার করা হলেও এদের মৌলিক কর্মকান্ড তাঁতকে কেন্দ্র করে। তাই এরা সকলেই তাঁতজীবী। কার্পাসজাত বস্ত্রশিল্পের সুতিকাগার ভারতবর্ষে বয়নের উৎকৃষ্টতম কেন্দ্র ছিল বাংলা। তাঁতশিল্প বাংলার সনাতন ঐতিহ্য এবং এর ধারক ও বাহক ছিলেন এখানকার তন্তুবায়কুল। একসময় বাংলার তন্তুবায়কুলের পারম্পরিক বয়ন কৌশলের দ্বারা সৃষ্ট 'মসলিন' সমগ্র পৃথিবীর বিস্ময় উদ্রেক করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু যে বাংলা সমগ্র 'পৃথিবীর তাঁতঘর' হিসেবে পরিগণিত হতো একসময়, সেই বাংলার তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার অধিকাংশই আলোচনার বাইরে থেকে গেছে। ফলে তাঁদের সম্পর্কে সামগ্রিক একটা চিত্র আমাদের সামনে ধরা দেয় না। তাঁদের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন হিন্দুপুরাণে কোথাও ভগবান শিবের মানসপুত্র শিবদাস এবং কোথাও বিশ্বকর্মাকে তন্তুবায়দের আদিপিতা বলা হয়েছে। ইতিহাসের ছিন্নপত্র পাতা থেকে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে তন্তুবায় সমাজ 'শূদ্র' হিসাবে পরিগণিত হতেন। প্রকৃতপক্ষে তন্তুবায় সমাজ 'নবশাখ' শ্রেণির অন্তর্গত। বাংলার তন্তুবায়কুলের মধ্যে যেমন বিভিন্ন প্রকার শ্রেণিবিভাগ রয়েছে তেমনই রয়েছে গোত্র এবং পদবির বৈচিত্র্য। তাঁদের জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক কাঠামো ইত্যাদি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলার এই তাঁতজীবী সম্প্রদায়কে নিয়ে যে সব আলোচনা হয়েছে তা হয় বস্ত্রশিল্পের অনুষঙ্গে, নয়তো জাতিকুলের প্রসঙ্গে। সেই সব অনুষঙ্গ-প্রসঙ্গ থেকে বাংলার তন্তুবায় সমাজের অতীত–ইতিহাসের সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই আলোচনায়।

সূচক শব্দসমূহ: বয়নশিল্প, বঙ্গদেশ, মসলিন, তন্তুবায়, নবশাখ, শূদ্র, হিন্দু ও মুসলমান তাঁতি

কারুশিল্পের অন্যতম প্রধান শাখা হল বয়ন। বয়নশিল্প অন্যান্য অনেকানেক প্রাচীন বিষয়ের মতোই উৎসাহব্যঞ্জক বর্ণিল ইতিহাস বহন করে। বয়নের শুরু ঠিক কবে হয়েছিল তা সুনির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও গবেষকরা অনুমান করেন যে আজ থেকে প্রায় ২০,০০০ বছর আগে মানুষ সর্বপ্রথম এই কাজের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। তবে সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়, ভূপৃষ্ঠের ঠিক কোন অঞ্চলে বা কোথায়, কোন পরিবেশে প্রথম বয়ন চর্চা আরম্ভ হয়েছিল। ঘাস ও লতাগুল্মের জড়াজড়ি, তাদের বাঁকানো-পাকানো বেড়ে ওঠা, পাখি ও কোনো কোনো প্রাণীদের ঘাস-লতা-পাতা দিয়ে বাসা তৈরির প্রক্রিয়া হয়তো বা আমাদের আদিম পূর্বপুরুষদের

বয়ন কার্যে উৎসাহ জুগিয়েছিল। পরবর্তীকালে কৃষি সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে তন্তু ফসলের উৎপাদন এবং আঙুলের সাহায্যে তন্তু পাকিয়ে সুতা তৈরি করতে শিখেছিল মানুষ। এই পদ্ধতির ব্যবহার শ্রমসাপেক্ষ হলেও তা সভ্যতার এক বিরাট অর্জন হিসাবে চিহ্নিত।

পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই সুতা তৈরি ও তন্তু বয়ন কার্যে প্রথম সৃষ্টির স্বীকৃতি দাবি করে থাকে। কিন্তু সত্য হল, প্রতিটি প্রাচীন জনগোষ্ঠীরই এই শিল্প ঐতিহ্যে তাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করেছে এবং আজকের গৌরবময় পরিস্থিতি নির্মাণ করেছে। চিনদেশের আকর্ষণীয় ফুলজ নকশা ও ড্রাগন, পারস্যের কিংখাব, মিশরের লিনেন, ভারতের সুতা ও রেশম, পেরুর বিচিত্র ট্যাপেস্ট্রি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, চরকা বা টাকু এবং তাঁতের উন্নতিতে প্রতিটি জাতির ভূমিকা একত্রিত হয়ে আমাদের বর্তমান বয়ন পদ্ধতির অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে।[১]

এই বয়ন কাজ যিনি সমাধা করেন তিনি তন্তুবায় বা তাঁতি। তাঁত তাঁদের প্রধান অবলম্বন। বংশপরম্পরায় চলে আসে এই জীবিকা। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত ‘বাঙ্গালা ভাষার অভিধান’ অনুসারে ‘তন্তুবায়’ মানে হল ‘সূতা দ্বারা যে বয়ন করে’ [তন্তু-বে (বুনা+অ (কত্‌র্তৃবাচ্যে)]। এই ‘তন্তু’ হল ‘চর্ম্ম কার্পাসাদি হতে মানুষের ক্রিয়া দ্বারা বিস্‌তৃত’ বস্তু। তন্তুবায় জাতি ‘তন্তুবাপ’ নামেও অভিহিত করা হয় যা তন্তুবায়ের সম অর্থকেই নির্দেশ করে [তন্তু-বপ্‌ (বুনা+অ (কত্‌র্তৃবাচ্যে)]।[২] এই ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বলা যেতে পারে যে, যখন থেকে মানুষ সভ্য হয়েছিল বা সভ্যতার পত্তন করেছিল, সেই সময় থেকেই মানবের লজ্জা নিবারণার্থে তন্তু বয়ন দ্বারা দেহ আচ্ছাদনের উপকরণ তৈরির বৃত্তি যারা গ্রহণ করেছিলেন, তারাই তন্তুবায় বা তন্তুবাপ নামে পরিচিত লাভ করেন। তাঁদের শনাক্তকরণে তন্তুবায়, তাঁতি, জোলা, যুগী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হলেও মৌলিক কর্মকান্ড তাঁদের তাঁতকে অবলম্বন করেই। ফলে এঁরা সবাই একটি অভিন্ন অভিধায় চিহ্নিত হতে পারেন আর তা হল ‘তাঁতজীবী’। সভ্যতার আদিলগ্ন থেকে অদ্যাবধি তন্তুবায় সমাজ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তাঁদের কর্ম সম্পাদন করে চলেছেন। বস্ত্র বয়ন যদি ‘শিল্প’ হিসাবে পরিগণিত হয় তাহলে এই তাঁতজীবীরা অবশ্যই ‘বয়নশিল্পী’। কিন্তু যুগ যুগ ধরে তাঁরা কারিগর নয়তো নেহাতই তাঁত শ্রমিক হয়ে থেকেছেন। শুধু তাই নয়, প্রাচীনকালের বর্ণ ব্যবস্থায় তাঁরা শূদ্র হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। এজন্যই বলতে দ্বিধা নেই, বয়নবৃত্তি এক অবমূল্যায়িত পেশা।[৩]

ভারতীয় উপমহাদেশে বয়ন বিষয়ে সবথেকে প্রাচীন ও একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে আছে সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নসামগ্রী। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োর নাগরিকদের ঘরে সুতা কাটবার টেকো ও অন্যান্য যে সমস্ত সরঞ্জাম পাওয়া গেছে তাতে বলা যায় যে, উলের ও তুলোর সুতা কাটা এবং কাপড় বয়নের রীতি সে যুগে বহুল প্রচলিত ছিল। এটা সম্ভবত ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব শ্রেণির লোকেরই একটা সাধারণ গৃহস্থালির কাজ ছিল। কারণ ধনী-দরিদ্র- সকল গৃহেই সুতা কাটবার টেকো পাওয়া গেছে। কোথাও এগুলো দামি উপাদানে তৈরি হয়েছে, কোথাও বা তৈরি হয়েছে শামুকের খোল বা মাটি দিয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, মাটির তলায় দীর্ঘদিন চাপা পড়ে থাকার ফলে সুতার তৈরি কোনো বস্ত্রই কালের অমোঘ বিধানকে লঙ্ঘন

করে রক্ষা পায়নি। কেবলমাত্র একটি রুপোর পাত্রের তলায় যে দু'এক টুকরো কাপড় পাতা ছিল, তাই কালের নিয়মকে উপেক্ষা করে টিকে গেছে। এই সুতা পরীক্ষাগারে বিশদভাবে পরীক্ষা করে জানা গেছে যে এগুলো উত্তর ভারতের কর্ষিত তুলার থেকে তৈরি মোটা ধরনের সুতা। এই তুলা কোনো বুনো গাছের তুলা নয়, একেবারে চাষ করা কার্পাস তুলা। নানারকম তামার তৈজসপত্রের সঙ্গে যে সব কাপড়ের নমুনা পাওয়া গেছে সেগুলোর বেশির ভাগই তুলার তৈরি সুতিবস্ত্র; কিছু আবার লিনেনের মতো গাছের আঁশ থেকে তৈরি। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কোথাও শণের তন্তুতে তৈরি বস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি।[৪]

হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে ভারতের বস্ত্রশিল্প চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। শ্রেষ্ঠ কার্পাসজাত বস্ত্রের উৎপত্তিস্থল এই দেশ। শ্রেষ্ঠ কার্পাসবস্ত্র উৎপন্ন হত মধুরা (মাদুরা), অপরান্ত, কলিঙ্গ, কাশী, বঙ্গ, বৎস এবং মহিষ জনপদে। বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি খ্রিস্টের জন্মের বহু আগেই দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৫] বহুদিন ধরে, বিশেষ করে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বাংলার কাপড়ের বিপুল চাহিদা ছিল। বাংলা তখন শুধুমাত্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেই নয়, এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে উত্তর আফ্রিকা, এমনকি ইউরোপের বহু দেশেই বস্ত্র রপ্তানি করত। বস্তুত বাংলা একসময় পৃথিবীর তাঁতঘরে পরিণত হয়েছিল।[৬] প্রাক-আধুনিক যুগে বাংলার বস্ত্রশিল্প চরম উৎকর্ষে পৌঁছেছিল। জেমস টেলরের মতে ঢাকার বিখ্যাত মসলিন খ্রিস্টাব্দের প্রথম শতক থেকেই ইউরোপে বিশেষ সুখ্যাতি ল্যাভ করে এবং এই কাপড় পরে রোম সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে অভিজাত রোমান মহিলারা তাঁদের দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শন করতে ভালোবাসতেন। আবার ওই শতকেরই অজ্ঞাত এক লেখকের 'পেরিপ্লাস অফ দ্য এরিথ্রিয়ান সি' নামক গ্রন্থে এক ধরনের মসলিনের উল্লেখ আছে যা খুব সম্ভবত পূর্ববঙ্গেই তৈরি হতো। বস্তুত প্রাচীনকালে হেরোডোটাস, স্ট্র্যাবো, টলেমি, প্লিনি প্রমুখ ইতিহাসবিদের বর্ণনায় বাংলার মসলিনের উল্লেখ পাওয়া যায়। নবম শতকে আরব পর্যটক ও ভূগোলবিদ সুলেইমান তাঁর 'সিলসিলাত-উৎ-তাওয়ারিখ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'রুমী' নামের এক রাজ্যে (খুব সম্ভবত এখনকার বাংলাদেশ) এমন সূক্ষ্ম ও মিহি কাপড় পাওয়া যায় যে ৪০ হাত লম্বা ও দুই হাত চওড়া একটি কাপড় একটি আংটির মধ্যে সহজেই চালাচালি করা যায়। আবার চতুর্দশ শতকে বাংলায় আগত মরক্কো দেশীয় পর্যটক ইবনে বতুতা ঢাকার কাছে সোনারগাঁওয়ে উৎপাদিত মসলিন দেখে মন্তব্য করেছিলেন যে, এমন চমৎকার ও উচ্চমানের বস্ত্র সারা পৃথিবীতে হয়তো আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। পঞ্চদশ শুকের প্রারম্ভে চিনা পর্যটক মাহুয়ান সোনারগাঁওয়ের মলমল ও মসলিন দেখে জানিয়েছিলেন যে, এই ধরনের মিহি কাপড় কী করে যে এখানকার তাঁতিরা বানায় তা সত্যিই বিস্ময়কর। ষোড়শ শতকের শেষে ইংরেজ পর্যটক রলফ ফিচ সোনারগাঁও পরিদর্শন করে লিখেছেন, এই শহরে ভারতবর্ষের মধ্যে সবথেকে উৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে সূক্ষ্ম কাপড় তৈরি হয়।[৭]

বস্ত্রশিল্প বাংলার অন্যতম সনাতন ঐতিহ্য আর এই ঐতিহ্যের ধারক ছিলেন বাংলার তন্তুবায়কুল। বস্ত্রশিল্পের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের সাথে সাথে তন্তুবায়দের আর্থ-সামাজিক

অবস্থারও একটি ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র তাঁতিদের জীবনযাপন নিয়ে গবেষণা বড়োই দুর্লভ। বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস বর্ণনায় ছেঁড়াখোঁড়াভাবে উঠে এসেছে তাঁদের সামাজিক অবস্থান, আর্থিক বিষয়। হাজার হাজার বছরের তাঁতি জীবনের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসকে স্বল্প পরিসরে ধরতে যাওয়া এককথায় প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই আলোচনায় তাই বাংলার তন্তুবায় জাতির সম্পর্কে কিছুমাত্র আভাস দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হল।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বিভিন্ন কারিগরদের উদ্ভব, পেশা ও জাতিগত পরিচয় প্রভৃতি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। এই পুরাণানুসারে, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা হলেন সকল শিল্পী সমুদয়ের আদিপিতা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ব্রহ্মখন্ড অনুযায়ী,অপ্সরা ঘৃতাচী শাপগ্রস্তা হয়ে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ রূপ গ্রহণ করে তাঁকে বিবাহ করেন। এঁদের নয়জন পুত্রের জন্ম হয় যাঁরা প্রত্যেকেই শিল্পী। এই নয়জন শিল্পী হলেন মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক বা তন্তুবায়, কুম্ভকার, কংসকার, স্বর্ণকার, সূত্রধর ও চিত্রকর যাদের একত্রে ‘নবশাখা’ বা ‘নবশাখ’ বা ‘নবশায়ক’ নামে অভিহিত করা হয়।[৮]

অপর একটি মতের সন্ধান পাওয়া যায় ‘বয়ন-বিদ্যা বা তাঁতশিক্ষা’ নামক একটি পুরাতন পুস্তিকাতে। এই পুস্তিকার প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে,বস্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে দেব-দানব-মানবের পরিধেয় ছিল বৃক্ষপল্লব, বল্কল ও পশুচর্ম। একদা বিষ্ণুলোকে আয়োজিত একটি ভোজন সভায় পরিবেশনকালে লক্ষীদেবীর বল্কলের কটিবন্ধন খসে পড়ায় দেবী কমলাকে যারপরনাই লজ্জিত হতে হয়েছিল। দেবতারা এর প্রতিকারের উপায় সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে ভোলানাথের শরণাপন্ন হন। অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে দেবাদিদেব মহাদেব দেব-দানব-মানবের লজ্জা নিবারণের জন্য নিজের জটা ছিঁড়ে তাই দিয়ে তন্তুবায় কুলতিলক শিবদাসের সৃষ্টি করেন। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার সাহায্যে তাঁত, চরকা, টাকু, মাকু ইত্যাদি তৈরি হল ও শিবদাস বস্ত্র বয়নে প্রবৃত্ত হলেন। বস্ত্রের প্রথম ও প্রধান উপকরণ কার্পাস তুলোর সৃষ্টি করলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা,তাঁর মানসোদ্‌ভূত দ্বিতীয় বৃক্ষই হল কার্পাস।[৯]

অপর একটি স্থানে শিবদাসের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মহাদেব নৃত্য করতে করতে ঘর্মাক্ত হন ও তাঁর গায়ের ঘাম থেকে এক পুরুষের উদ্ভব হয় যার নাম ঘামদাস বা শিবদাস। বস্ত্রবয়নের জন্য মহাদেব শিবদাসকে অনুমতি করেন ও বস্ত্রবয়নের জন্য কার্পাস সৃষ্টি করেন।[১১] আবার এক জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিশ্বচরাচরের সুরাসুর ও মানব সমাজের বসনহীনতার দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে দেবাদিদেব মহাদেব দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে বস্ত্র বয়নকর্মের সূচনা করতে আদেশ করলে বিশ্বকর্মা যোগীর মত গুণসম্পন্ন বায়কের আকাঙ্খা প্রকাশ করেন। এরপর কোনো একদিন জগন্মাতৃকার সাথে আলাপচারিতার অবসরে শূলপাণির অকস্মাৎ বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় বিশ্বকর্মার আকাঙ্খার কথা স্মরণ হয় এবং ত্রিপুরারির মানস ক্ষেত্র হতে এক দিব্য পুরুষের জন্ম হয়-

“তদা পূর্বস্মৃতৈশ্চৈব বভূবোদয় এ বহি।

চিত্তে হরস্য সন্তানঃ সঞ্জাতোহতি মনোহরঃ।।"

জন্মের পরক্ষণেই সেই মানস পুত্র নিজের পরিচিয় ও সৃষ্টির হেতু জানতে চাইলে দেবাদিদেব তাঁকে জানান যে তাঁর নাম শিবদাস এবং তন্তুবয়নহেতু তাঁর জন্ম হয়েছে-

"শ্রুয়তাং পুত্র মদ্বাক্যং শিবদাসো ভবিষ্যসি।

তস্মান্মমাংশে ত্বং জাতো ভবেহস্মিন তন্তুবায়কঃ।।"[১১]

এই শিবদাসকেই তন্তুবায়দের আদিপুরুষ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। এই শিবদাসের সাথে আদিমাতার মানসকন্যা কুশাবতী দেবীর বিবাহ হয় এবং তাঁদের অষ্ট পুত্রের জন্ম হয়। যথা সময়ে এই অষ্ট পুত্রের যথাবিধি বিবাহ সম্পন্ন করে শিবদাস মানবকুলের নিমিত্ত বস্ত্র বয়নহেতু সকলকে মর্ত্যে প্রেরণ করেন। কথিত আছে, শিবদাসের এই অষ্টপুত্র থেকেই তন্তুবায়দের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণিবিন্যাসের উদ্ভব ঘটেছে। এই আটজনের মধ্যে চারজন আর্যাবর্তে ও চারজন বঙ্গদেশে উপনীত হন। বঙ্গদেশে আগত শিবদাসের এই চার পুত্র হলেন- বলরাম,উদ্ধব,পুরন্দর বা মধুসূদন ও জনার্দ্দন বা মধুকর। এই চার জনের মধ্যে বলরাম পূর্ববঙ্গে, উদ্ভব উত্তরবঙ্গে, পুরন্দর মধ্যবঙ্গে ও জনার্দ্দন দক্ষিণবঙ্গে বসবাস শুরু করেন।

বলরামৌ যযৌ শ্রীলঃ পূর্ব্ববঙ্গং স্ত্রিয়া সহ।

ধামরায় পুরীং বস্তুমানন্দেন সুখেন চ।।

জগামোত্তরবঙ্গে স উদ্ধবো বুদ্ধিসাগরঃ।

বাসং কত্র্তুং স্ত্রিয়া সার্দ্ধং মধ্যবঙ্গে পুরন্দরঃ।।

দেবক্রিয়া কৃতে তন্ত্র যমবঙ্গে জনার্দ্দনঃ।

স্ত্রিয়া সার্দ্ধমাজগ্রাম ধর্ম্মং বাসং কত্র্তুং সুখেন চ।।[১২]

কালক্রমে এই চার কুল থেকে অসংখ্য উপকুলের সৃষ্টি হয়। যথা-বলরামী, উওরকুল, পুরন্দরী, মধুকরী, আশ্বিনে বা অসন, বারেন্দ্র, বড়ভাগিয়া বা ঝাঁপানে, ছোটভাগিয়া বা কায়েত, কুটুরে, কোড়া, ক্ষীরে ইত্যাদি। এরা আবার অনেক উপবিভাগে বিভক্ত। যেমন-বর্ধমানী, মান্দারণী, মধ্যকুল, বর্ণকুল, উত্তরকুল, মগী, রাঢ়ী, পূর্বকুল, দক্ষিণকুল, মড়িরাণী, নীর, উদ্ভবী ইত্যাদি। হুগলি জেলার তন্তুবায়রা সাধারণত বারেন্দ্রী বা বসাক, উত্তরকুল, মধ্যকুল ও দক্ষিণকুল।[১৩]

তন্তুবায়দের উদ্ভব ও শ্রেণিবিন্যাস প্রসঙ্গে উপরোক্ত আলোচনা পুরাণভিত্তিক। এর বাস্তবতা আছে না নেই, সেই বিতর্কে না গিয়েও তন্তুবায়দের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিভাজনকে

অস্বীকার করার কোনও উপায় বোধহয় নেই। কিন্তু বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশের তাঁতিদের মধ্যে এতপ্রকার বিভাজন কিভাবে সৃষ্টি হল তার কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা কোথাও পাওয়া যায়নি।

বাংলার তন্তুবায় সমাজের নানাবিধ শ্রেণির সাথে সাথে গোত্রের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবতঃ পুরাণের যুগ থেকেই সমাজে পরিচয়ের আদি রূপ হিসাবে ‘গোত্র’ পরিগণিত হয়ে আসছে। গোত্রের দিক থেকে তন্তুবায়দের মধ্যে যে সকল গোত্র পরিলক্ষিত হয় সেগুলি হল অগস্ত্য, অদ্যদাসী, আলম্যান, অত্রি, অগ্নি, অলদ্, অলঙ্গ, নাগ, পাত্তু, দূর্বা, মঙ্গল, বররাশি, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, ব্রহ্ম, গর্গ, গৌতম, কাশ্যপ, কুল্য, মৌদগল্য বা মধুকুল্য, সাবর্ণ, ব্যাস ইত্যাদি।[১৪] তন্তুবায় জাতির উদ্ভব প্রসঙ্গে প্রচলিত মতগুলি পৌরাণিক; এর বাস্তবতা থাকুক বা না থাকুক, পুরাণের যুগ থেকেই যে গোষ্ঠীগত কারণে তন্তুবায়দের মধ্যে বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে বোধহয় সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

বিভাগ ও গোত্রের বৈচিত্র্যতার সাথে সাথে বাংলার তন্তুবায় জাতির পদবির তালিকাও যথেষ্ট দীর্ঘ। তন্তুবায়দের মধ্যে যেসব পদবি রয়েছে সেগুলি হল-আশ, কর, কুন্ডু, গুঁই, চন্দ, ছাগবি, তোষ, দে, দত্ত, দাস, দালাল, নান, নন্দী, পাল, প্রামাণিক, বসাক, বরাশ, বিট্, বিষয়ী, ভড়, মান্না, মুখিম, মেষ, মন্ডল, যাচনদার, রুদ্র, রক্ষিত, লু, হান্সি প্রভৃতি।[১৫]

বৈদিক যুগের বর্ণব্যবস্থা অনুসারে তন্তুবায়রা শূদ্র হিসাবে পরিগণিত। বর্ণসঙ্করের মধ্যে তাঁদের উল্লেখ নেই। অতএব তাঁরা বর্ণসঙ্করও নন। শূদ্রের স্বাভাবিক বৃত্তি দ্বিজশুশ্রূষা। কিন্তু এই কাজের দ্বারা তাঁর পরিবারের ভরণপোষণ না হলে সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য- এই তিন বর্ণের শুশ্রূষা হয়, এমন কোনো শিল্প কর্ম করতে পারে। অর্থাৎ শূদ্ররা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সেবা করে জীবিকা নির্বাহ করতে অসমর্থ হলে মনুসংহিতায় তাঁদেরকে ধনী বৈশ্যের পরিচর্যা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করার কথা বলা হয়েছে। বস্ত্র বাণিজ্য বৈশ্যের বৃত্তি। অতএব যেসব বৈশ্য বস্ত্রের বাণিজ্য করেন, শূদ্রেরা বস্ত্র বয়ন রূপ শিল্পকর্ম দ্বারা সেইসব বৈশ্যের পরিচর্যার মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করতে পারবেন। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে-

“শূদ্রস্তু বৃত্তিমাকাঙ্খেৎ ক্ষত্রমারাধয়েদ্ যদি।

ধনিনং বাপ্যুপারাধ্য বৈশ্যং শূদ্রো জিজীবিষেৎ।।”[১৬]

অর্থাৎ শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ শুশ্রূষায় জীবিকা নির্বাহে অসমর্থ হয়ে বৃত্তি আকাঙ্খা করে তবে সে ক্ষত্রিয়ের পরিচর্যা দ্বারা জীবন নির্বাহ করবে। একইভাবে ধনী বৈশ্যের পরিচর্যার দ্বারাও জীবন যাপন করবে। যে সকল শূদ্র এইরূপ বস্ত্র বয়ন করতেন, তারাই মনুর সময়ে তন্তুবায় নামে পরিচিত হয়েছিলেন। সুতরাং মনুর সময়ে শূদ্ররাই বস্ত্র বয়ন করতেন। চতুরবর্ণ ও বর্ণসঙ্করের মধ্যে বৈশ্যরাই কেবলমাত্র বস্ত্র বাণিজ্যের অধিকারী ছিলেন। অর্থাৎ তন্তুবায়রা ছিল মূলত শূদ্র শ্রেণির। তন্তুবায়রা বস্ত্র বয়ন করতেন এবং বৈশ্যরা সেই সকল বস্ত্রাদির বাণিজ্য

করতেন। ফলে 'বস্ত্র বয়ন' ও 'বস্ত্র বাণিজ্য' দুটি আলাদা আলাদা বৃত্তিরূপে পরিগণিত ছিল। তৎকালে শূদ্রদের মধ্যে তন্তুবায় বলে কোনো বর্ণগত বিভাগ ছিল না; তা কেবলমাত্র কর্মগত বিভাগ হিসাবে পরিগণিত হত। পরবর্তীকালে তন্তুবায় বিভাগটি কুলগত বর্ণবিভাগ বলে প্রবর্তিত হয়। মনুর সময় থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত শূদ্ররা কেবলমাত্র বস্ত্র বয়নই করতেন। এরপরে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি উপরোক্ত শাস্ত্রের এই সংক্রান্ত ব্যবস্থার পরিবর্তন করে শূদ্রদের বণিক বৃত্তি অবলম্বন করার অধিকার প্রদান করেন। এই সময় থেকেই তন্তুবায় সমাজের কেউ কেউ বস্ত্র বাণিজ্য করতে শুরু করেন।[১৭] এরপরে খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে হিন্দুসমাজের পুনঃ সংস্কার আরম্ভ হলে নতুনভাবে জাতি বিচার করা হয়েছিল। এই সময়ই চতুরবর্ণের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র - এই তিনটি বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। বৈশ্যরা এই সময় শূদ্রের অন্তর্গত হয়ে পড়ে। এরপর বল্লাল সেনের সময় (রাজত্বকাল: ১১৬০-১১৭৯ খ্রিস্টাব্দ) বাংলার বৈশ্য শ্রেণির অস্তিত্ব পুরোপুরি বিলীন হয়ে যায়।[১৮] ফলে বস্ত্র বয়ন ও বস্ত্র বাণিজ্য দুটি বৃত্তিই একই জাতির পেশা হিসাবে পরিগণিত হয়।

একসময় হিন্দু সম্প্রদায়ের কারিগররাই তাঁতি পেশায় আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ঊনিবিংশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত এই পেশার লোকজন আশ্বিনে তাঁতি নামে পরিচিত ছিল।[১৯] বাংলার তন্তুবায়দের মধ্যে যতগুলি শ্রেণি আছে তাদের মধ্যে আশ্বিনে তাঁতিরা বলে থাকেন যে তাঁরাই আদি তন্তুবায়, অন্যান্য শ্রেণি তাঁদের শাখা। হুগলি ও দুই চব্বিশ পরগণা জেলায় এই তাঁতিদের বসবাস রয়েছে।[২১] এই শ্রেণির তন্তুবায়দের মহিলারা নাকে নোলক পরতেন যা তাঁদের সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের নির্দশন ছিল।[২১] তন্তুবায় সমাজের মধ্যেও উচ্চ ও নিম্নশ্রেণির ভাগ আছে। রংপুর, যশোহর, ফরিদপুর, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার তন্তুবায়রা নিম্নশ্রেণির বলে জানা যায়।[২২]

বাংলা তথা ভারতের বয়ন শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকা। এই অঞ্চলের তাঁতিরাদের মধ্যে নানা ধরনের শ্রেণিবিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। ঢাকা শহরের তাঁতিবাজার ও নবাবপুর ছিল তন্তুবায়দের প্রধা বসতি। এই এলাকার তাঁতিরা ছিল মূলত বসাক পদবিধারী। ঢাকার বসাকরা আবার দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা- বড়ভাগিয়া ও ছোটভাগিয়া। বড়ভাগিয়াদের সংখ্যা ছিল বেশি এবং ছোটোভাগিয়ারা সংখ্যায় অল্প ছিল। বড়ভাগিয়াদের আরেক নাম ছিল 'ঝাঁপানে তাঁতি' আর ছোটোভাগিয়াদের নাম ছিল 'কায়েত তাঁতি'। বড়ভাগিয়াদের বিবাহের সময় বর 'ঝাঁপান' নামক একটি বিশেষ আসনে উপবিষ্ট হয়ে বিয়ে করতেন। এই থেকেই এই শ্রেণি 'ঝাঁপানে তাঁতি' বা 'ঝাঁপানিয়া তাঁতি' বলে পরিচিত হয়।[২৩] ঊনবিংশ শতকের আটের দশকে ঢাকাতে মাত্র কুড়ি থেকে পঁচিশ ঘর কায়েত তাঁতির বসবাস ছিল।[২৪] কি কারণে এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাসের উদ্ভব হয়েছিল তার কোনো যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে ছোটভাগিয়াদের মধ্যে একটা প্রচলিত ধারণা ছিল যে তারা প্রথমে কায়স্থ ছিলেন এবং পরে বসাক উপাধি ধারণ করে বসাকদের সমজাতিত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন।[২৫] এই কারণে ছোটভাগিয়ারা 'কায়েত তাঁতি' নামে পরিচিত হতেন। গোবিন্দচন্দ্র বসাক তাঁর 'বঙ্গীয় জাতিমালা' পুস্তকে কায়েত তাঁতিদের সম্পর্কে বলেছেন, "বাস্তবিক ছোটভাগিয়ারা কায়স্থ নহে। মালদহ হইতে যে সমস্ত বসাক

সর্বশেষ ঢাকা নগরে উপনিবেশ স্থাপন করে তাহারাই ছোটভাগিয়া নামে প্রসিদ্ধ। ঢাকার বৈশ্য বসাকরা তাহাদিগকে আপন অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়া মনে করেন এবং তাহাদিগকে ঐ নাম দিয়াছেন।”[২৬] মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৫-১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ) ইসলাম খাঁ বাংলার বারো ভুঁইয়াদের দমন করে সেখানকার শাসনভার গ্রহন করেছিলেন এবং রাজমহল থেকে ঢাকাতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। তিনি ১৬০৮ -১৬১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকার শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। রাজমহল থেকে ঢাকাতে রাজধানী স্থাপনকালে সেখানকার বসুক বণিকেরা ঢাকাতে চলে আসেন এবং এরাই ছোটভাগিয়া নামে আখ্যায়িত হন। ফরাসী পর্যটক ট্যাভারনিয়ারের বর্ণনা থেকে জানা যায়, “RAJMAHAL is a town on the right bank of the GANGES,……...It was formerly the residence of the Governors of BENGAL, because it is spending hunting country, and, moreover, the trade there was considerable. But the river having taken another course, and passing only at a distance of a full half league from the town, as much for this reason as for the purpose of restraining the King of ARAKAN, and many Portuguese bandits who have settled at the mouths of the GANGES, and by whom the inhabitants of DACCA, up to which place they made incursions, were molested, - the Governor and the merchants who dwelt at RAJMAHAL removed to DACCA, which is to-day a place of considerable trade.”[২৭] তবে জেমস ওয়াইজের বিবরণে এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর লেখা থেকে অবগত হওয়া যায় যে, ছোটভাগিয়া বা কায়েত তাঁতিরা পূর্বে স্বর্ণকার ছিলেন এবং সোনার কাজের থেকে তাঁত বোনা তৎকালে অধিক লাভজনক কাজ হওয়ায় তাঁরা বস্ত্রবয়ন শুরু করেছিলেন। তারা বসাকদের সাথে ওঠাবসা করলেও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য তেমন ছিল না। তবে অপেক্ষাকৃত বিত্তবান কায়েত তন্তুবায় পরিবারগুলি বিশেষ অধিকার অর্জন করেছিল এবং বড়ভাগিয়ারা ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করতেন।[২৮]

তাঁতিদের মধ্যে ‘যুগী’ বলে আরেকটি তন্তুবায় শ্রেণির উল্লেখ পাওয়া যায়। হিন্দুদের মধ্যে যারা ভোগা কার্পাস দিয়ে মোটা কাপড় তৈরি করত তাদের যুগী বলা হতো। তারা সবাই নিম্নশ্রেণির লোক ছিল। তারা মহিষের শিং দিয়ে মাকু তৈরি করত এবং খইয়ের মাড়ের পরিবর্তে ভাতের মাড় দিয়ে সুতা শক্ত করত। এইজন্য তাদের কেউ পছন্দ করত না এবং বর্ণচোরা তাঁতিরা তাদের ঘৃণা করত। তাঁতিরা যুগীদের সাথে কোনও সামাজিক সম্পর্ক রাখত না।[২৯] পূর্ববঙ্গের যুগীরা দুই ভাগে বিভক্ত। একটি ‘মাহিষ্য সম্প্রদায়’। তারা দক্ষিণ বিক্রমপুর, ত্রিপুরা ও নোয়াখালির বাসিন্দা। অন্যটি হল ‘একদেশী’, তাদের বাস উত্তর বিক্রমপুর, বৃহত্তর ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে।[৩০] ঢাকা শহরের যে অংশে তারা বসবাস করত সেটিকে বলা হয় যুগীনগর।[৩১] যুগীরা ঐতিহ্যগতভাবেই মূলত ধুতি ও গামছা বয়ন করে থাকে। তাঁতিদের ব্যবহৃত তাঁত থেকে যুগীদের তাঁতের গঠনেও খানিকটা পার্থক্য দেখা যায়। যুগীদের ব্যবহৃত তাঁত অপেক্ষাকৃত ভারী হয়। তাদের ব্যবহৃত মাকুও পৃথক আকৃতির হয়ে থাকে। তারা হিন্দু সমাজে নমঃশূদ্র শ্রেণিভুক্ত এবং বর্ণ হিন্দুরা তাদেরকে অস্পৃশ্য বলে মনে করে।[৩২] এছাড়াও ঢাকার মগবাজারে ‘মগী’ নামে আরেক ধরনের তাঁতি সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল।[৩৩]

ঢাকা শহর থেকে প্রায় কুড়ি মাইল উত্তরে ধামরাই নামক স্থানে শহরের তাঁতিদের থেকে পৃথক একশ্রেণির তাঁতিদের বসবাস ছিল। এঁদের বলা হত ‘বঙ্গ তাঁতি’। এই তাঁতিরা নিজেদের বাংলার আদি তাঁতি হিসাবে দাবি করতেন। এই বিশেষ তন্তুবায় গোষ্ঠীর বিয়েতে কনেরা লাল বা অন্যান্য রঙিন শাড়ির পরিবর্তে সাদা শাড়ি পরিধান করতেন।[৩৪]

তাঁতি একটি পেশার নাম। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাঁতিদের দেখতে পাওয়া যায়। মুসলিম ধর্মাবলম্বী তাঁতিদের ‘জোলা’ নামে অভিহিত করা হয়। উত্তর ভারতের একটি বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠী ‘জোলাহা’ নামে পরিচিত যারা বস্ত্র বয়নের সঙ্গে যুক্ত। ধারণা করা হয় যে, এই বয়ন কারিগররাই প্রথম পেশাজীবী গোষ্ঠী হিসাবে হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় সমগ্র বাংলাদেশ মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তন্তুবায়দের একটা বড় অংশই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এক সময় এঁদের মধ্যে থেকে অনেকেই পাঞ্জাব থেকে বাংলা ও দক্ষিণের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিবাসী হয়েছিলেন। তখন ছিল ভারতে ইসলামি শাসনের যুগ। পরবর্তীকালে এই দক্ষিণী মুসলিম তাঁতিদের বলা হতো ‘ডেক্কানি মোমিন’ মানে দক্ষিণী মোমিন বা জোলাহা। ‘ডেক্কানি’ সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ ‘দক্ষিণ’। বাংলা একাডেমির ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে ‘জোলা- মুসলিম তাঁতি’ বলা হয়েছে। হিন্দি, উর্দু জোলাহা শব্দটির মূল পারসি শব্দ ‘জোলাহ’ যার অর্থ ‘সুতার গোল্লা’ বা ‘বয়ন কারিগর’। আর বাংলায় শব্দটি জোলা, বাংলার অন্যতম তাঁতজীবী সম্প্রদায়। এদের একটি বড় অংশই ধর্মান্তরিত মুসলিম হলেও একটি ক্ষুদ্র অংশ আজলাফ গোত্রভুক্ত। বস্ত্র উৎপাদনকারী এই জোলা সম্প্রদায় অত্যন্ত সরল ও নিরীহ প্রকৃতির। এরা কাজের বাইরে কিছুই বুঝতো না। খাও দাও, কাজ করো। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আরব, পারস্য ও আরবের তুর্কি ব্যবসায়ীরা বাংলার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে এবং সরাসরি এদেশীয় তন্তুবায়দের সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন করতেন। দেশীয় তন্তুবায়রা এত সহজ সরল ছিলেন যে তাঁরা বিদেশি বণিকদের কাছ থেকে তাঁদের নিজেদের পাওনা টাকাপয়সা ঠিকমতো বুঝে নিতে পারতেন না। কেউ কেউ মনে করেন, সে কারণেই তাঁদের বোকা মনে করা হয়েছিল। আর কালক্রমে জোলা শব্দটিই বুঝি বোকা শব্দের সমার্থক হয়ে উঠল।[৩৫]

মুসলমান তাঁতজীবীদের মধ্যে জোলাদের থেকে পৃথক আরেকটি স্বতন্ত্র্য কৌম রয়েছে। এঁরা মূলত জামদানি ও অপেক্ষাকৃত মোটা ধরনের মসলিন বয়নের সাথে যুক্ত ছিলেন। এই দুই শ্রেণির বয়নজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে জলাচল সম্পর্ক থাকলেও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল না। এই তাঁতিরা নিজেদের ‘কারিগর’ বা ‘জামদানি তাঁতি’ হিসাবে পরিচয় দিতেন। ঢাকা অঞ্চলের ডেমরা, নবীগঞ্জ ও লাক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী বয়ন গ্রামগুলিতে এই শ্রেণির তাঁতিদের বসতি ছিল।[৩৬]

ইতিহাসের অলিগলি ঘুরে বাংলার তন্তুবায় সমাজের সম্পর্কে এই আলোচনায় যে বিষয়গুলো তুলে ধরা প্রচেষ্টা করা হল তাকে কেবল সূচনামাত্র বলা যায়। সারা বঙ্গদেশে (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের আরও নানান অজানা

ইতিহাস। সেইসব অকথিত ইতিহাসকে তুলে আনা প্রয়োজন আর তার জন্য দরকার নিরবচ্ছিন্ন ও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রসমীক্ষা ও গবেষণা। বাংলার বস্ত্রশিল্পকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল এই অঞ্চলের তন্তুবায়কুল। কিন্তু ইতিহাস গবেষণায় বিস্তৃত আঙিনায় তাঁরা যেন কিছুটা ব্রাত্যই থেকে গেছেন, স্রষ্টার থেকে অধিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর সৃষ্টি। বাংলার এই তাঁতজীবী সম্প্রদায়কে নিয়ে যে সব আলোচনা হয়েছে তা হয় বস্ত্রশিল্পের অনুষঙ্গে, নয়তো জাতিকুলের প্রসঙ্গে। তবে ইদানীংকালে কিছু গবেষক এই নিয়ে গবেষণায় অগসর হয়েছেন। ভবিষ্যতে এই নিয়ে আরও বৃহত্তর আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি হবে, এই আশা করাই যায়।

তথ্যসূচি

১. শফিকুল কবীর চন্দন: তন্তুবায় স্বরূপ সন্ধান, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা-২০১৪, পৃষ্ঠা-১৫-১৮

২. জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস: বাঙ্গালা ভাষার অভিধান,সাহিত্য সংসদ,প্রথম খন্ড,পৃষ্ঠা-৯৫৬

৩. শফিকুল কবীর চন্দন: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯

৪ শফিকুল কবীর চন্দন: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৩-২৪

৫. নীহাররঞ্জন রায়: বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব, দ্র'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ১৪৬-১৪৭

৬. সুশীল চৌধুরী: পৃথিবীর তাঁতঘর বাংলার বস্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য, আনন্দ, কলকাতা-২০১৪, পৃষ্ঠা-১

৭. সুশীল চৌধুরী: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯-১০

৮. অচ্যুত প্রামাণিক, তন্তুবায় জাতির উপ-পদবীর সন্ধানে,তন্তুবায় স্মরণিকা,শান্তিপুর তন্তুবায় সংঘ-২০০৬,পৃষ্ঠা-৩০; শফিকুল কবীর চন্দন: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮

৯. হরিপদ বসাক: পুস্তক পর্যালোচনা, বয়ন-বিদ্যা বা তাঁত শিক্ষা (অপ্রকাশিত)

১০. শৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ: বাঙালি জাতি পরিচয়, সাহিত্যলোক, কলকাতা-২০০৬, পৃষ্ঠা-৫৭

১১. সৈকত রায়: উৎসারিত আলো,তন্তুবায় স্মরণিকা,শান্তিপুর তন্তুবায় সংঘ-২০০৬,পৃষ্ঠা-২৪-২৫

১২. সৈকত রায়: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৫

১৩. শৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ:পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮

১৪. শৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮

১৫. শৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮

১৬. মদনমোহন হালদার: বসুক অর্থাৎ বসাকাদি-উপাধি-বিশিষ্ট জাতির পরিচয়, প্রথম ভাগ, কলকাতা-১৮৯৫, পৃষ্ঠা-২২

১৭. মদনমোহন হালদার: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২-২৪

১৮. মদনমোহন হালদার: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮

১৯. শফিকুল কবীর চন্দন: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮

২০. শৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ:পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮

২১. শফিকুল কবীর চন্দন: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯

২২. শৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ:পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮

২৩. Taylor, James: Sketch of the Topography and Statistics of Dacca, Calcutta-1840, p-230; শৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ:পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮

২৪. Wise, James: Notes on the Races, Castes, and Trades of Eastern Bengal, London-1883, p-383

২৫. মদনমোহন হালদার: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১২৯

২৬. শৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ:পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮

২৭. মদনমোহন হালদার: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৩১

২৮. Wise, James: Ibid, p-383

২৯. আবদুল করিম: ঢাকাই মসলিন, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৬৫, পৃষ্ঠা-১০৪-১০৫

৩০. শফিকুল কবীর চন্দন: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮

৩১. মুনতাসীর মামুন:ঢাকার মসলিন (ইতিহাস ও ঐতিহ্য ১), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৫

৩২. শফিকুল কবীর চন্দন: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮

৩৩. Wise, James: Ibid, p-383

৩৪. Wise, James: Ibid, p-382

৩৫. শফিকুল কবীর চন্দন: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯-৪০

৩৬. Wise, James: Ibid, p-382